প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর
কলকাতা - ৭০০ ০৭৬

প্রকাশিকা :
প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬

২৩ ডিসেম্বর, ২০২২
© শ্রীসারদা মঠ

মূল্য : ১০ টাকা

মুদ্রক :
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড
দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর
উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩২

প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমগঙ্গা তাঁর দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমায়ের মাধ্যমে জগতে প্রবাহিত হয়েছিল; একইসঙ্গে সেই প্রেম ধারণ ও বিতরণ করেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে একটি কথাতেই প্রকাশ করা চলে—প্রেম। প্রেমের প্রকাশ সেবায়—দেহমনবুদ্ধি-আত্মা সবকিছুর যথাযোগ্য সেবায়। প্রেম ও সেবা একই—অন্তরের প্রেম দেহের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেই তা সেবা। এটিই যুগধর্ম। প্রেমের আদর্শ তথা সেবার আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আগুনের পরশমণির স্পর্শে জ্বলে উঠেছে কত জীবনদীপ। লোকচক্ষুর অগোচরে তিলে তিলে আত্মোৎসর্গের আদর্শে রূপ নিয়েছে কত মহাজীবন। ত্যাগে প্রেমে বৈরাগ্যে ভক্তিতে সেবায় পরিপূর্ণ এমনই এক মহান জীবনকথা অনুধ্যানের প্রয়াস এই পুস্তিকায়। মহাজীবনকে লিপির তুলিতে আঁকবার চেষ্টা বৃথা—তবু এছাড়া পথও তো নেই!

প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর জন্ম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে। পূর্ব নাম কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা শোভনা দেবী। পিতা ছিলেন হাওড়া ইস্টার্ন রেলের ডিভিশনাল সুপার-ইনটেন্ডেন্ট অফিসার। তাঁর নিজস্ব বাসভবনটি ছিল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে, ৮ নং হাজরা রোডে। মা ছিলেন অতিসম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা এবং স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছে

দীক্ষিত। শ্যামবাজারের প্রভূত ঐশ্বর্যবান ও প্রতিপত্তিশালী দয়ানন্দ চৌধুরির জ্যেষ্ঠা কন্যা তিনি। মাতাজীর পিতৃকুলের অনেকেই ছিলেন তন্ত্রসাধক, যোগসাধক।

দশ ভাইবোনের মধ্যে কল্যাণী ছিলেন সেজো। তাঁদের সাত বোনের মধ্যে শৈশবেই তিন জন মারা যান। সোমবার জন্ম বলে জননী তাঁকে 'ভোলা' বলে ডাকতেন। শৈশবে মাতুলালয়ের পাশেই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে তাঁর বিদ্যালয়জীবনের সূচনা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা গৌরীমা তখন আশ্রমের দায়িত্বে। তাঁকে কল্যাণী 'ঠাকুমা' সম্বোধন করতেন। পরে কল্যাণী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর ছোটমামা ছিলেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী ধ্যেয়ানন্দ—গোপাল মহারাজ। তিনি স্বামী আত্মবোধানন্দের (সত্যেন মহারাজ, মায়ের বাড়ি এবং নিবেদিতা স্কুলের সম্পাদক) দীর্ঘদিনের সেবক ছিলেন। কল্যাণীর পিতার মাসতুতো ভাই হরিচরণও সন্ন্যাসী ছিলেন—স্বামী অভিন্নানন্দ। তাঁরই প্রেরণা ও উৎসাহে বাড়িতে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারার প্রবেশ, পরিবারের শিশুদের বেলুড় মঠে যাওয়া এবং মহারাজদের পূত সান্নিধ্য লাভ। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কল্যাণী কৈশোরেই ত্যাগের জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেশ কয়েকজন পার্ষদকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। বেলুড় মঠে পরম পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন তিনি। যেহেতু মহারাজ এলাহাবাদেই বেশি থাকতেন, তাই তাঁর সঙ্গলাভের তেমন সুবিধা কল্যাণীর হয়নি।

স্বামী দয়ানন্দ দক্ষিণ কলকাতার বকুলবাগান রোডে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুলাই 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেছিলেন প্রসূতি মায়েদের ও শিশুদের সেবার জন্য। কল্যাণীকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, তাঁকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিইয়ে হসপিটালের কাজে যুক্ত করতে চাইতেন। দয়ানন্দজীর মুখে নার্সিং প্রশিক্ষণের কথা শুনে কল্যাণী ছুটে খাটের

তলায় গিয়ে লুকোতেন। মহারাজ স্নেহভরে বলতেন, ''কল্যাণীকে টেনে টেনে এত বড় করব যে সবাই একদিন হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে।'' ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাক্য অমোঘ, কালই তার প্রমাণ রেখেছে।

ওই বকুলবাগান স্থিত হসপিটালেই গোপাল মহারাজ কল্যাণীর নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেন। তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে একটি ছোট বাক্স নিয়ে কল্যাণী চলে এসেছিলেন। ১৯৩৬ অথবা ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে তৎকালীন 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান' থেকে নার্সিং পাস করেন। এটি ছিল বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রিকৃত মিডওয়াইফারি কোর্স।

১৯৩৮ সালের ৪ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ হসপিটালের স্থায়ী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আসেন ৯৯ ল্যান্সডাউন রোডে (বর্তমানে ৯৯ শরৎ বসু রোড, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান)। এই সময়কার একটি ঘটনা মাতাজীর মুখে প্রায়ই শোনা যেত। বকুলবাগানে ডিউটি করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলেন পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এসেছেন, এক্ষুনি চলে যাবেন। শোনামাত্র তিনি সব ছেড়ে প্রাণপণে দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হন। বেলুড় মঠ থেকে মহারাজ এসেছিলেন একটি ফোর্ড গাড়িতে। তিনি তখন অসুস্থ। গাড়িটি ভিত্তিস্থাপনের স্থান পর্যন্ত যায়; মহারাজ না নেমেই ইট স্পর্শ করে দেন এবং অর্ঘ্য দেন। তাঁর কাছ থেকে পূজনীয় অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দজী) ওইগুলি নিয়ে ভিত্তিস্থানে স্থাপন করেন। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন কল্যাণী। তিনি এরপর মহারাজের গাড়িতে উঠে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন। মাতাজীর মনে পড়ত, সেখানে শরবত-ভর্তি একটি বড় জালা রাখা ছিল, যেটি থেকে সকলকে শরবত দেওয়া হচ্ছিল। পরের বছর ৩১ মে ১৯৩৯ স্নানযাত্রার পুণ্যতিথিতে তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ হসপিটালের নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

সেই পুণ্যক্ষণেও কল্যাণী উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪০ সাল পর্যন্ত কল্যাণী শিশুমঙ্গলের সঙ্গে কর্মিরূপে যুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি অন্তর্মুখ আশ্রমজীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষায় কোনও গ্রামের শান্ত পরিবেশে চলে আসতে চান। ইতোমধ্যে হরিচরণ মহারাজ, গৌর মহারাজ (স্বামী নিরন্তরানন্দ) এবং প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চব্বিশ পরগনার টাকি শহরে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। এঁরা পূর্বে ছিলেন কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। স্বামীজীর ভাবাদর্শে একটি গঠনমূলক কাজ করতে চেয়েই তাঁদের ওই প্রয়াস। ১৯৩৮ সালে এটি রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছিল, হরিচরণ মহারাজ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদ ও পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য, ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নির্বেদানন্দ এই আশ্রমের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। পূর্বাশ্রমের সম্পর্ক থাকায় কল্যাণী হরিচরণ মহারাজকেই অনুরোধ জানান আশ্রমে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে সনৎ মহারাজও (স্বামী প্রবোধানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদ ও পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য) আন্তরিকভাবে চাইতেন স্বামীজীর পরিকল্পিত মেয়েদের মঠ হোক এবং সেজন্য বহু অল্পবয়সি মেয়েকে অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের ভাগ্নী আরতি (পরে প্রব্রাজিকা সেবাপ্রাণা) শিশুমঙ্গলেই নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে কাজ করছিলেন। সনৎ মহারাজ কল্যাণী ও আরতি উভয়কেই আশ্রমজীবন যাপনে উৎসাহ দেন।

কল্যাণী ও আরতির কর্মনিষ্ঠা ও গভীর আগ্রহ দেখে দয়ানন্দজী বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে হসপিটালের স্থায়ী কর্মিরূপে আশা করতেন, এমনকী বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁদের রাখতে চাইতেন। কিন্তু সনৎ মহারাজ ও হরিচরণ মহারাজের গভীর অনুপ্রেরণায় সাধুজীবন যাপনই ক্রমশ তাঁদের অন্তরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে কল্যাণী ও আরতি হসপিটাল ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারে

মনস্থির করেন।

হরিচরণ মহারাজ কল্যাণীর অনুরোধটি বিবেচনা করে ঠিক করেন, মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম টাকিতে যদি হয়, তবেই তিনি সাহায্য করতে পারবেন। তিনি, নির্বেদানন্দজী প্রমুখ আলোচনা করে স্থির করেন, সস্ত্রীক প্রফুল্লবাবু টাকিতে এসে থাকলে তাঁদের অভিভাবকত্বে এই আশ্রমজীবন যাপনেচ্ছু মেয়েরা থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, নিঃস্বার্থ দেশসেবাব্রতী প্রফুল্লবাবু সর্বদা দেশ ও দশের কাজে ব্যস্ত থাকতেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী উৎসবের সময় তিনি সারা ভারতবর্ষে 'Lantern lecture' দিয়েছিলেন। সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন এই শিষ্যকে সস্নেহ সমর্থন জানিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ প্রফুল্লবাবুর সহধর্মিণী হেমপ্রভা দেবীকে বলেছিলেন, ''ও যে কাজ করছে, তার জন্য কোনও ক্ষোভ কোরো না, বা ওকে কাজে বাধা দিয়ো না। তোমাদের সংসার ঠিক চলে যাবে।'' এখন নির্বেদানন্দজী প্রমুখের অনুরোধে প্রফুল্লবাবু সপরিবারে টাকি এসে থাকতে সম্মত হলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে তাঁর বড় মেয়ে আশার (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। স্বামীজী-পরিকল্পিত মেয়েদের মঠ সম্বন্ধে জানার পর তিনি ওইরকম মঠজীবন যাপনের প্রবল আগ্রহ অনুভব করতেন। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে প্রফুল্লবাবু সস্ত্রীক, দুই কন্যা সহ—কল্যাণী, পরে প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা এবং মীনা—টাকি চলে আসেন। শিশুমঙ্গলের কল্যাণী ও প্রফুল্লবাবুর কন্যা কল্যাণীকে এখন থেকে যথাক্রমে 'বড় কল্যাণী' ও 'ছোট কল্যাণী' বলে ডাকা হতে থাকে।

এভাবে টাকিতে শুরু হল এঁদের আশ্রমজীবন। মেয়েদের এই আশ্রমের জন্য জমি দান করেছিলেন টাকির জমিদার সনৎ রায়চৌধুরি। ক্রমে ক্রমে বেশ কিছু মেয়ে সেখানে সমবেত হলেন। অতি অনাড়ম্বর জীবন। আশ্রমের ছোট ঠাকুরঘরে নিত্য ঠাকুরসেবা, সান্ধ্য আরতি, সকাল-সন্ধ্যায় ভজন, জপধ্যান, একঘণ্টা করে ধর্মপুস্তক পাঠ। নিজেদের

পড়াশোনা তো ছিলই। টাকি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাইমারি বিভাগের মেয়েদের ক্লাস—প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত—তখন এই আশ্রমেই নেওয়া শুরু হল। একটি তাঁতও ছিল, অবসর ও ইচ্ছামতো সকলেই কিছু কিছু বুনতেন। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা অতি সাধারণ হলেও তাঁদের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত। আশ্রমে অনেকখানি জায়গা ছিল—সেখানে তাঁরা বাগান করতেন, খেলাধূলাও করতেন। একটা পুকুর কাটা হয়েছিল—সোৎসাহে সকলে দিনকতক সাঁতারও শিখলেন। প্রায় রোজই সকালের দিকে সবাই মিলে প্রকৃতির কোলে বেড়িয়ে আসতেন। সকলের চোখেই এক স্বপ্ন—সবাই লেখাপড়া শিখবে, মেয়েদের মঠ হবে।

টাকি রামকৃষ্ণ মিশনে কোনও মহারাজ এলেই—স্বামী নির্বাণানন্দজী, নির্বেদানন্দজী, তেজসানন্দজী প্রমুখ—মেয়েদের আশ্রমটি দেখতে যেতেন এবং সাগ্রহে প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা দিতেন। নির্বাণানন্দজী তাঁদের 'খণ্ডন ভববন্ধন' ইত্যাদি আরাত্রিক ভজন শুনে 'ঠিক আছে' বলে অনুমোদন করেছিলেন। পরদিন আবার এসে তিনি আশ্রমে আহারাদি করেন। সেদিনের আনন্দময় স্মৃতি মেয়েরা কোনওদিন ভুলতে পারেননি। নির্বেদানন্দজী তাঁদের সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত জীবন দেখে বলেছিলেন, ''আমাকে সকলে বলে মেয়েদের জন্য একটা কিছু করতে। কিন্তু আমি কেন করব? মেয়েরাই তো নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারে। সে-ক্ষমতা তাদের আছে।'' বস্তুত স্বামীজীর আদর্শে কয়েকজন অল্পবয়সি মেয়ের আশ্রমজীবন যাপন পূজনীয় সন্ন্যাসীদের বিশেষ স্নেহ ও শুভেচ্ছা আকর্ষণ করেছিল।

টাকিতে থেকে পড়াশোনার অসুবিধা বিবেচনা করে আশা (পরে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা) প্রমুখ অনেকেই আশ্রম ছেড়ে প্রথমে গোবরডাঙা ও পরে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তাঁরা বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থেকে আশ্রমজীবন যাপন করছিলেন। স্বামী বিরজানন্দজীর অনুপ্রেরণায় তার নাম হল 'সারদা আশ্রম'। টাকিতে

থেকে গিয়েছিলেন কল্যাণী, আরতি, প্রতিমা (কল্যাণীর বোন, পরে প্রব্রাজিকা জ্যোতিঃপ্রাণা) প্রমুখ। মুসলিম লিগের আহ্বানে দাঙ্গা শুরু হলে ১৯৪৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর টাকি থেকে কল্যাণীরা চলে আসেন। সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দ) পরামর্শে কল্যাণী ও আরতি পড়াশোনার সুবিধা হবে ভেবে নিবেদিতা স্কুলে থাকতে যান। কিন্তু তাতে তেমন সুবিধা না হওয়ায় তাঁরা বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটের আশ্রমেই থাকতে শুরু করেন। এখানে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কল্যাণী আর মহাবিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করেননি, আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ওই আশ্রমে তখন প্রায় কুড়িজন ত্যাগের জীবন কাটাতে চেয়ে সমবেত হয়েছিলেন, প্রায় সকলেই পড়াশোনা করতেন। তাঁদের দেখাশোনার ভার নিয়েছিলেন কল্যাণী। তাঁরা ল্যান্সডাউন রোডেও একটি বাড়ি সাত বছরের জন্য ভাড়া নেন। ২ মে ১৯৪৮ কল্যাণীই প্রথম (আর একজন আশ্রমিক সহ) সে-বাড়িতে থাকতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট ও ল্যান্সডাউন রোড—এই দুটি স্থানের আশ্রমেই প্রয়োজনমতো থাকতে হত তাঁকে।

টালিগঞ্জের শ্রীমোহন লেনে রমাপ্রসাদ রায় তাঁর অনেকটা জমির ওপর একটি পুরনো বাড়ি ও কিছু অর্থ উইল করে রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেছিলেন। শর্ত ছিল, সেখানে একটি প্রসূতিসদন খুলতে হবে। স্বামী দয়ানন্দজীর ইচ্ছা ছিল ওইটি 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে'র অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু গভর্নিং বডির অন্যান্য সদস্যরা চেয়েছিলেন সেটি স্বতন্ত্র হসপিটাল হোক। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর প্রস্তাব ছিল, কল্যাণী ও আরতি উভয়েই ওই হসপিটালটির ভার নিতে পারেন যেহেতু উভয়েই নার্সিং ট্রেনিং প্রাপ্ত। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

দূরদর্শী আশা বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত মঠ গড়ে তুলতে হলে বেলুড় মঠের সঙ্গে যেভাবে হোক যুক্ত থাকতেই হবে। তাঁরই উদ্যোগে এবং পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ব্যবস্থায় 'সারদা

আশ্রম' নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯৫০ সালের ৩০ জুলাই। স্কুল তখন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র। সারদা আশ্রমের সদস্যারা এখন থেকে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ অধীনে এলেন এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তাঁদের বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মী হতে লাগলেন। ৩০ জুলাই নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে সংযুক্তির পর ১৫ আগস্ট থেকে তাঁরা স্কুলে থাকতে চলে আসেন; শ্রীমোহন লেনের বাড়িতে থেকে গেলেন বড় ও ছোট কল্যাণী, আরতি, জয়া (প্রব্রাজিকা ঋতপ্রাণা) প্রমুখ।

ইতোমধ্যে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিয়ে শ্রীমোহন লেনের বসতবাড়িটিকে প্রসূতিসদনের উপযোগী করে 'মাতৃভবন' নামকরণ হল। ১৯৫০ সালের ১৩ অক্টোবর 'মাতৃভবনে'র উদ্বোধনকার্য সম্পন্ন করলেন তৎকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ প্রমুখ। হসপিটাল উদ্বোধনের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। ১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রিয় মহারাজ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) মাতৃভবন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে রামকৃষ্ণ মিশন একটি পরিচালক সমিতি গঠন করেন। সমিতির বারো জন সদস্যের মধ্যে প্রিয় মহারাজই ছিলেন একমাত্র সন্ন্যাসী; নিবেদিতা স্কুল থেকে রেণুকা (প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা), আশা (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা) এবং মাতৃভবন থেকে কল্যাণী (প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা), জয়া (প্রব্রাজিকা ঋতপ্রাণা) ও তরু দেবীকে (প্রব্রাজিকা শুভাপ্রাণা) সমিতির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৪ সালের ২৬ নভেম্বর অকস্মাৎ স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ দেহত্যাগ করলে, ১৯৫৫ সাল থেকে হসপিটাল পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হল ত্যাগী কর্মীদের উপর। কল্যাণী ও জয়া যথাক্রমে সম্পাদিকা ও সহ সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন।

বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে (১৯৫৩-৫৪)

স্বামীজীর পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে আশ্রমজীবন যাপনেচ্ছু যেসব মহিলা কর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে সাতজনকে নির্বাচন করে তাঁরা ব্রহ্মচর্য দানের পরিকল্পনা করেন। তাঁদের মধ্যে কল্যাণী ছিলেন অন্যতম। তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সাতজন ব্রতধারিণীকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দান করেন। ইতোমধ্যে মেয়েদের মঠের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁরা কাশী থেকে সরলা দেবীকে আনিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সেবিকা সরলা দেবী শরৎ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর সাতাশ বছর যাবৎ কাশীধামে তপস্যা করছিলেন। শঙ্করানন্দজীর পুনঃপুনঃ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি কাশী ছেড়ে আসতে রাজি হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে 'সুরধুনী কানন' নামক বাড়িতে শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীকে স্থাপন করেন স্বামী শঙ্করানন্দজী। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি মায়ের জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে তিনি পূর্বোক্ত সাতজন ব্রহ্মচারিণী এবং সরলা দেবীকে (শরৎ মহারাজের কাছে পূর্বেই সন্ন্যাসপ্রাপ্ত এবং 'শ্রীভারতী' নামপ্রাপ্ত) যথাবিধি বিরজা হোম করে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। কল্যাণীর নাম হল প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা। অন্যান্যরা : প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা, প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা দয়াপ্রাণা, প্রব্রাজিকা মেধাপ্রাণা। এঁরাই শ্রীসারদা মঠের প্রথম আটজন সন্ন্যাসিনী।

নবীন সন্ন্যাসিনীদের পাঁচজন সন্ন্যাসের কয়েকদিন পর আনন্দ করে জয়রামবাটী-কামারপুকর তীর্থদর্শন করতে যান। প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণার সে-সুযোগ ঘটল না। মাতৃভবনে ফিরে যেতে হবে তাঁকে, গাড়ি এসে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে' থাকার উপদেশ স্মরণ করে সেদিন ভক্তিপ্রাণা মর্মবেদনার মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করলেন। সেই কথা কটি তাঁর জীবনে মহামন্ত্র হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসের পর সতীর্থদের সঙ্গে জয়রামবাটী-কামারপুকুর যেতে না পারার আক্ষেপ তাঁর মুখে কেউ কোনওদিন শোনেনি।

প্রব্রাজিকা মেধাপ্রাণা ব্যতীত অপর সাতজন সন্ন্যাসিনীকে ওই বছর (১৯৫৯) আগস্ট মাসে ট্রাস্টি করে তাঁদের ওপর স্বাধীন সারদা মঠের ভার অর্পণ করেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ। ১৯৬০ সালের ১৩ মে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন রেজিস্ট্রিকৃত হলে তাঁরা গভর্নিং বডির সদস্য হন। ১৮ নভেম্বর ১৯৬১ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে মাতৃভবন হস্তান্তরিত করেন। তখন থেকেই ভক্তিপ্রাণামাতাজী মাতৃভবনের সম্পাদিকা—২০০৯ সালে সঙ্ঘাধ্যক্ষা হয়ে সারদা মঠে চলে আসা পর্যন্ত।

১৯৫৮ সালে ছোট কল্যাণীর (তখন ব্রহ্মচারিণী) সঙ্গে তীর্থভ্রমণ ভক্তিপ্রাণামাতাজীর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সে-যাত্রায় তাঁদের ভ্রমণসূচিতে ছিল মায়াবতী, হরিদ্বার, কনখল। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ তখন স্বামী গম্ভীরানন্দজী। তিনি তাঁদেরকে পিতার মতো স্নেহ করতেন। দুজনের নামই কল্যাণী, তাই স্নেহসিক্ত কণ্ঠে টেনে টেনে বলতেন, ''বড়টি আর ছোটটি।'' তাঁর অপরিসীম স্নেহযত্ন আর আতিথ্য তাঁরা পেয়েছিলেন। তখন লোহাঘাটে নেমে অদ্বৈত আশ্রম পর্যন্ত হেঁটে যেতে হত। তাঁরা লোহাঘাট পৌঁছে দেখেন গম্ভীরানন্দজী একটি লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন ঘোড়া সহ, সঙ্গে খাবার আর ফ্লাস্কে কফি। লিখে পাঠিয়েছেন, মালপত্র ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাঁরা যেন হেঁটে আসেন, চড়াই দেখে যেন ঘাবড়ে না যান কারণ ওইটুকু পেরুলেই সোজা রাস্তা। মহারাজ নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিছু দূর গিয়ে ঝরনা দেখতে পেলে তার ধারে বসে কফি খেয়ে নিতে হবে। তাঁরা তা-ই করলেন কিন্তু ঝরনায়

হাত ধোয়ার পর হাত প্রচণ্ড নীল হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা তখন বোঝেননি যে ঠান্ডায় রক্ত জমে গেছে। আশ্রমে পৌঁছলে মহারাজ তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। এই সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে। দুজনেই প্রথম পাহাড়ে গিয়েছেন, জানতেন না যে সেখানে হাঁটলেই গরম আর বসলেই ঠান্ডা লাগে। তাই আশ্রমে তাঁরা ঢোকার পর মহারাজ যখন বললেন ''চলো বসার ঘরে গিয়ে বসি'', তখন তাঁরা দুজনেই তাড়াতাড়ি বললেন, ''না মহারাজ, খুব গরম হচ্ছে, এই বারান্দাই ভাল, এখানেই বসি।'' মহারাজ হেসে বললেন, ''ঠিক আছে, এখানেই বসি।'' মিনিট দুয়েক কাটতে না কাটতেই তাঁদের খুব শীত করতে লাগল। অবশেষে বাধ্য হয়ে বললেন, ''চলুন মহারাজ, ঘরেই বসি।'' মহারাজ আবার হেসে বললেন, ''বেশ তো চলো।''

'মাদার্স বাংলো'য় তাঁরা থাকতেন। এমন সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য আর এমন নৈঃশব্দ্য তাঁরা কখনও উপভোগ করেননি। সারাদিন শব্দ বলতে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। নীল আকাশের বুকে তুষারাবৃত পর্বতচূড়াগুলির উপর সূর্যকিরণের প্রতিফলন দেখেই দিন কাটত। পূজনীয় মহারাজ প্রথমেই খোঁজ নিয়েছিলেন তাঁদের কাছে গরম জামাকাপড় কী কী আছে এবং প্রয়োজনমতো সব দিয়েছিলেন। শুদ্ধাপ্রাণাজী পরে বলতেন, সেবার ভুল-বোঝাবুঝির ফলে তিনি নিজের কম্বল নিয়ে যাননি, কিন্তু ভক্তিপ্রাণাজী এত আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের কম্বলটি তাঁকে ব্যবহার করতে দেন যে তিনি সেটি নিতে বাধ্য হন। এটি সম্ভবত যাত্রাপথের ঘটনা। আশ্রম থেকে তাঁদের খাবার যেত বাংলোয়। এক-একদিন এক-একটি জিনিসের আচার থাকত। মহারাজ বলেছিলেন, পাহাড়ে আনাজপাতির অভাব, একঘেয়ে রান্না, তাই স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে এতরকম আচার করে রাখা হয়। একদিন মহারাজ বায়নাকুলার দিয়ে বিখ্যাত শৃঙ্গগুলি তাঁদের দেখিয়েছিলেন। মাতাজীরা মায়াবতী থেকে শ্যামলাতাল যাওয়ার পথে সুখীডাং-এ একটি লোককে তাঁদের নিতে

পাঠান গম্ভীরানন্দজী। কিছুক্ষণ পর সে চা খেতে চলে যায় এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেলেও আর আসে না। তার দু-একদিন আগেই মহারাজ শ্যামলাতাল চলে গিয়েছিলেন। তিনি আর মতি মহারাজ হেঁটে হেঁটে তাঁদের খোঁজে এলে তাঁদেরকে মাতাজীরা সব জানালেন। শুনে গম্ভীরানন্দজী বললেন, ''কেন লোকটিকে ছাড়লে? তোমরা কি 'অতীতের স্মৃতি' পড়নি? জান না, স্বামীজী কুলিদের বিশ্রাম করতে অনুমতি দেওয়ায় তাঁদের কী দুর্ভোগ হয়েছিল?'' সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সব মনে পড়ে গেল, কিন্তু আগে তো মনে পড়েনি! শ্যামলাতাল পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। সেখানে মতি মহারাজ রোজই তাঁদের রকমারি পদ রান্না করে খাওয়াতেন। এরপর তাঁরা হরিদ্বার ও কনখল হয়ে ফিরে আসেন।

ভক্তিপ্রাণামাতাজী বহুবার কাশীধামে গিয়েছেন। তার মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা—পূজনীয়া ভারতীপ্রাণামাতাজীকে সমস্ত ব্যবস্থা করে কাশী নিয়ে যাওয়া। ১৯৬৮ সালে একদিন মঠে ট্রাস্টি মিটিং-এর শেষে ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে ভক্তিপ্রাণাজী জানতে চান, তাঁর কাশী যেতে ইচ্ছে হয় কী না। কাশী ছিল তাঁর প্রাণ, চোদ্দো বছর হয়ে গেছে তিনি সেখান থেকে চলে এসেছেন। শুনে ভারতীপ্রাণামাতাজী নিস্পৃহভাবে বললেন, ইচ্ছে হলেই কি আর সব হয়? একা চলতে পারেন না, চোখে ভাল দেখতে পান না। তাঁর ইচ্ছে বুঝতে পেরে ভক্তিপ্রাণাজী এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হন। গঙ্গা ও বিশ্বনাথ মন্দিরের মাঝখানে দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর 'টাকি নিবাস'-এ থাকার ব্যবস্থা করেন। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করতে তিনি ২৭ অক্টোবর ১৯৬৮ কয়েকজনকে নিয়ে কাশী রওনা হন। তিনতলার বড় ঘরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে মন্দিরের মতো করে স্থাপন করে সেখানে তিনি জপধ্যান ও ভজনের ব্যবস্থা করেন। মঙ্গলারতি, জপধ্যান, ভজন, গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ দর্শন, জলযোগ, প্রসাদগ্রহণ, পাঠ, ভক্তদের দর্শনের নির্দিষ্ট সময়, সন্ধ্যারতি, একাদশীতে রামনাম—এই রুটিন ঠিক করেন ভক্তিপ্রাণাজী, যাতে একটা আশ্রমিক পরিবেশে

ভারতীপ্রাণামাতাজীর সঙ্গে সকলে আনন্দে থাকতে পারেন।

ভারতীপ্রাণামাতাজী ৩১ অক্টোবর কাশী পৌঁছন। এতদিন পর আবার কাশীতে এসে তিনি বালিকার মতো আনন্দ করতেন। কলকাতা থেকে প্রায়ই সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী ও দলে দলে ভক্তরা কাশীতে যেতে থাকেন তাঁর পূত সঙ্গলাভের আশায়। সকলেই আনন্দ আর তৃপ্তি নিয়ে ফিরতেন। ভক্তিপ্রাণাজীর ব্যবস্থাপনায় এসব সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বনাথ দর্শন ও গঙ্গাস্নান ছিল তাঁদের নিত্য উৎসব। ভোরবেলা মঙ্গলারতির পরই ভক্তিপ্রাণাজী একদলকে নিয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে বেরিয়ে যেতেন। সারাদিন আর কোথাও যাওয়ার অবকাশ তাঁর হত না। কারণ ভক্তসমাগম, ভারতীপ্রাণামাতাজীর কখন কী প্রয়োজন, প্রসাদের ব্যবস্থা, অন্যান্য নানা কাজে তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হত। ভারতীপ্রাণামাতাজীর ইচ্ছানুসারে তিনি একদিন অদ্বৈত আশ্রমে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেন।

পরবর্তী কালে ভক্তিপ্রাণামাতাজী কাশীবাসের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বলতেন, ''মাকে আমরা নিরানন্দ থাকতে দেখেছি বলে বড় একটা মনে পড়ে না। সব কিছুর ভাল দিকটা গ্রহণ করা, অন্যদেরও সেই দিকটা দেখিয়ে দেওয়া, ধরিয়ে দেওয়া তাঁর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।...

''এই সদা-চঞ্চল মায়ার জগতেও স্থানকাল এবং সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যে মায়াতীত শাশ্বত মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায় এবং তখন এই সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাও ওতপ্রোত হয়ে আছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাই বুঝি বা কাশীতে শব শিবে পরিণত হন, ভয় আনন্দে রূপান্তরিত হয়।

''মার (ভারতীপ্রাণামাতাজীর) আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যে যার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম। মার মধ্যে কোনওদিনই আমরা লোক-দেখানো ব্যবহার, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার চেষ্টা ইত্যাদি দেখিনি। কাশীতে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন, তাই আমার অসাক্ষাতে সকলকে বলতেন, 'ভক্তিপ্রাণা কেমন সব সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল, তাইতে সকলে কত আনন্দ

পেল। ওর জন্যই আমার এবারের কাশীবাস হল।' মা খুশি হয়েছেন—এই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ওই মহাতীর্থে মাতৃসঙ্গ আমাদের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে।"

বলা বাহুল্য, 'সবকিছুর ভাল দিকটা গ্রহণ করা, অন্যদেরও সেই দিকটা দেখিয়ে দেওয়া, ধরিয়ে দেওয়া,' লোকদেখানো ব্যবহার বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করা—এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ভক্তিপ্রাণামাতাজীর চরিত্রও মণ্ডিত করেছিল।

মাতাজী কেদার-বদরি প্রভৃতি তীর্থদর্শনে যান ১৯৭৩ সালে। সহযাত্রীরা বলেন, এত শক্তসমর্থ শরীর ছিল তাঁর যে সব রাস্তাটুকু হেঁটেই যান তিনি, আর সব ব্যাপারে এমনভাবে মানিয়ে নিয়ে চলতেন যে কারও মনেই হত না তিনি সকলের চেয়ে অনেক বড়।

মাতৃভবন হসপিটাল ছিল মাতাজীর কাছে মন্দির, তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সকালে সারা হসপিটাল মোছা হয়ে গেলে ধুনো দেওয়ার রীতি চালু করেছিলেন তিনি। সকালবেলা প্রথমে হসপিটালের সিঁড়ি ছুঁয়ে প্রণাম করে সিঁড়িতে পা দিতেন। একজন লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করে মাতৃভবনে ত্যাগব্রতীরূপে যোগদান করতে এলে মাতাজী তাঁকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে বলেন, ''এই তোমার মন্দির।" বস্তুত মাতৃভবনে সেবারত সকল সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীই বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই কথাটি বহুবার মাতাজীর মুখে শুনেছেন। মাতাজী এই ধারা প্রবর্তন করেন যে, হসপিটালে রান্না হওয়ার পর প্রথমে পেশেন্টদের জন্য খাবার যাবে, তারপর অন্যেরা খেতে পারবে। মাতৃভবন শুরুর সময় মাতাজী আর সেবাপ্রাণাজী ভোরে উঠে প্রথমে হসপিটালের বাথরুম পরিষ্কার করে, বেডপ্যান মেজে তবে স্নান করতেন; তারপর পোশাক পরে ডিউটি দিতে যেতেন। মাতৃভবন এবং সংলগ্ন অঞ্চলে মাতাজী 'বড়মা' নামে পরিচিত। বলতে গেলে মাতৃভবন এবং 'বড়মা' আজ প্রায় সমার্থক হয়ে

গিয়েছে। মাতাজী বলতেন, ''মাতৃভবন মায়ের জায়গা। এখানে থেকে বেতালে পা ফেলা চলবে না।'' ডাক্তারদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, হয়তো আলুভাজার সঙ্গে তরকারি লেগে গেছে। দেখে সঙ্গে সঙ্গে থালা পালটে সুন্দর করে গুছিয়ে দিতেন। বলতেন, ''এভাবে কাউকে খেতে দেয়?'' পেশেন্টদের তরকারি রোজ নিজে খেয়ে দেখতেন। পেশেন্টদের খাবারে ঝাল দিতে নেই, তাই মাতাজী যদি দেখতেন ঝাল হয়েছে তাহলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন, রান্নার দায়িত্বে যারা থাকত তাদের সতর্ক করতেন। মাতাজী কখনও 'পেশেন্ট' বা 'রোগী' বলতেন না, বলতেন 'মা'। ডিউটি করে-আসা সিস্টারদের জিজ্ঞাসা করতেন, ''মায়েরা ভাল আছে?'' এই ভাবটি তিনি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত করে গেছেন।

গেটে একটা বেল থাকত, নতুন পেশেন্ট এলেই সেটা বাজানো হত। তাই শুনে সিস্টাররা নেমে আসতেন। কোনও কারণে বেল শুনে তাঁদের পক্ষে নামা সম্ভব না হলে, দুবার বেল বাজলেই বড়মা নিজে নেমে যেতেন। হয়তো তখনই জপ করতে বসেছেন—জপের মালাটি রেখে অথবা হাতে নিয়েই চলে যেতেন। হয়তো সারাদিন পরে খেতে বসেছেন, তখনই বেল বেজেছে; সঙ্গে সঙ্গে খাবার ছেড়ে উঠে পড়তেন। মাতৃভবনের প্রথমদিকে তাঁদের খাওয়ার সংস্থানও তেমন ছিল না। ডাল ভেজে গুঁড়ো করে রাখতেন, তা-ই মেখে ভাত খেতেন।

প্রথমদিকে যখন শুধু মাতাজী আর সেবাপ্রাণাজী ছিলেন তখন তাঁরা রোগীর প্রয়োজনে ভারি ভারি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেতেন—কারও ওপর নির্ভর করতেন না বা কাউকে ডেকে সময়ও নষ্ট করতেন না। পরবর্তী কালেও জমাদার না এলে মাতাজী নিজেই বেডপ্যান মেজে রাখতেন। একবার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় হাসপাতালের একটি ব্লক উদ্বোধন করতে আসেন। অন্য একটি ব্লক পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রথমেই তিনি রোগীর বাথরুমে ঢুকে যান। বেডপ্যান দেখে এসে সঙ্গে সঙ্গে সত্তর হাজার টাকার চেক

লিখে দেন। বলেন, এখানে ঠিক ঠিক সেবাকাজ হয়।

জমাদাররা বলত, ''যদি আমরা স্ট্রাইক করি তাহলে যতদিন বড়মা আর আরতি মা আছেন ততদিন আমাদের কেউ আর ডাকবে না। ওঁরা নিজেরাই কাজ চালিয়ে নেবেন। আর ওঁরা যদি না থাকেন তাহলে আমাদের ছাড়া চলবে না।''

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতবার যে মাতাজী রাউন্ড দিতেন—রান্নাঘর থেকে শুরু করে প্রতিটি জায়গায়। সবসময় হসপিটাল জুড়ে তাঁর উপস্থিতি—লিফ্‌ট যখন হয়নি তখনও—এই তিনি হসপিটালের বারান্দায়, এই লেবাররুমে, এক্ষুনি ও.টি.-তে তো এক্ষুনি ডাইনিং হলে, আবার পরক্ষণেই আউটডোরে। সজাগ দৃষ্টি সর্বত্র। রাতে ডিউটিতে থাকা নার্সরা জানত যেকোনও সময় বড়মা এসে পড়বেন। যেকোনও বিভাগের কর্মী কোনও সমস্যা নিয়ে মাতাজীর কাছে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিয়ে শুনে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হতেন, নিজে সেই দায়িত্ব নিয়ে নিতেন।

কখনও কখনও মাতাজী বই নিয়ে রাউন্ডে যেতেন। যে-মায়েদের শরীর অপেক্ষাকৃত একটু ভাল, তাদের পড়তে দিতেন যাতে তাদের মন ভাল থাকে। আবার যখন দেখতেন কারও খুব কষ্ট হচ্ছে, তার কাছে গিয়ে পরম মমতায় গায়ে হাত বুলিয়ে, আরও নানাভাবে কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতেন।

রোগীরা ডাক্তারদের চেয়ে তাঁকেই বেশি বিশ্বাস করত। ডাক্তারের রাউন্ডের পর হয়তো মাতাজী গিয়েছেন, তাঁকে দেখেই রোগীরা রোগ সম্পর্কিত নানা অভিযোগ জানাত। ''ডাক্তারকে বললে না কেন'' জিজ্ঞাসা করলে তারা বলত, ''আপনাকে বললেই ভাল হয়ে যাবে।'' মাতাজীর অনুমানও হত অব্যর্থ। কারও চোখ দেখেই হয়তো হিমোগ্লোবিন টেস্ট করাতে বললেন। অবধারিতভাবে ধরা পড়ত সে অ্যানিমিক।

যাঁদের রাতে হসপিটালে ডিউটি পড়ত, তাঁদের প্রতি মাতাজীর নির্দেশ ছিল : ''রাতে মায়েদের ঘুমোতে দিয়ো।'' অর্থাৎ সদ্যোজাতকে সামলানোর দায়িত্ব তাঁদের। সকালে উঠে যখন মায়েরা হাসিমুখে বলতেন তাঁরা রাতে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমিয়েছেন, তখন তাঁরাও নিঃস্বার্থ সেবাদানের তৃপ্তিলাভ করতেন।

ডিউটিরত অবস্থায় নার্সদের প্রণাম মাতাজী কখনও নিতেন না। বলতেন, ''এ-পোশাকের আলাদা মর্যাদা আছে।'' শুনে শ্রোতারাও এ-কাজের মহত্ত্ব অনুভব করতেন।

সকলের প্রতি মাতাজীর অসীম করুণা, ভালবাসা ও সেবাভাব কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে। যে যত অবহেলিত তার প্রতি তাঁর তত ভালবাসা। একজন জমাদার এত মদ খেত যে তার লিভার একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মাতাজী নিজে মাংস রান্না করে তাকে খাওয়াতেন। কারণ হিসেবে বলতেন, ভাল জিনিসের স্বাদ পেলে মন্দ জিনিসটা সে ছেড়ে দেবে। ঝাড়ুদার বা ওইরকম কেউ মদ খেয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে দেখলে মাতাজী তাকে ডেকে এনে পেট ভরে ভাত খাইয়ে বলতেন, ''যাও এখন বাড়ি গিয়ে ভাল করে ঘুমোও।''

একবার এক ব্রহ্মচারিণীকে নিয়ে মাতাজী বাজারে গিয়েছেন। ফেরার পর ব্রহ্মচারিণী রিকশাওয়ালাকে ভাড়া জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর শোনার আগেই মাতাজী সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলে হাতের মুঠোয় টাকাপয়সা যা উঠল সব দিয়ে দিলেন। সবসময় তাঁকে এমনটি করতেই দেখা যেত।

সববিষয়েই মাতাজীর সহজাত এক সতর্কতা দেখা যেত। হয়তো সবাই মিলে কোথাও যাওয়া হবে—কোনও ভক্তের পাঠানো গাড়ি এসেছে, মাতাজী গাড়িতে উঠেই জানতে চাইতেন, কোথায় যেতে হবে ড্রাইভার জানে কী না। হয়তো সকলেই ভাবছেন সে জানে, কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে জানা যেত সে জানে না। আবার কোথাও গিয়ে

প্রথম খোঁজ করতেন ড্রাইভারদের খাওয়া হয়েছে কী না, যদি রাত্রে থাকতে হয় তবে তার শোয়ার জায়গা ঠিক হয়েছে কী না। সেবিকারা যদি বলতেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হয়েছে, তবু তিনি সেবিকাকে খোঁজ নিয়ে আসতে বলতেন।

আশ্রমিকদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে মাতাজী রোজ তাঁকে দেখতে যেতেন। হয়তো কারও খুব জ্বর, মাতাজী নিজে গিয়ে মাথা ধুয়ে দিতেন, টেম্পারেচার না নামা পর্যন্ত বসে থাকতেন। স্টাফদের ক্ষেত্রেও তাই।

১৯৭৮-এর বন্যায় স্থানীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় মাতাজীর তত্ত্বাবধানে ব্যাপক সেবাকাজ আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ভুবনেশ্বরে সুপার সাইক্লোন হলে মাতাজী সেখানে ত্রাণসেবা করতে যান। যাওয়ার আগের দিন ম্যালেরিয়া, ১০৪-১০৫ জ্বর। তবু পরদিন মাতাজী ভুবনেশ্বরে যান। অতি প্রত্যন্ত বন্যাদুর্গত অঞ্চল—যেখানে কেউ যেতে পারছে না—সেখানেও মাতাজী যেভাবে হোক পৌঁছে যেতেন। ওড়িশায় তিনি বহুবার সেবাকাজ করেছেন। সেখানকার মানুষ তাঁর কথা সজলনয়নে স্মরণ করেন। একবার ওড়িশা থেকে সাত-আটজন মেয়ে মাতাজীর আহ্বানে মাতৃভবনে এলেন বেলুড় মঠ-সারদা মঠ-জয়রামবাটী-কামারপুকুর দর্শন করতে। মাতাজীর ব্যবস্থাপনায় তাঁদের তীর্থদর্শন হল। ফিরে যাওয়ার আগের দিন মাতাজী জানতে চাইলেন তাঁরা কী খেয়ে ভোরবেলা রওনা হবেন। তাঁরা গ্রামের মানুষ, ভাত খেয়েই অভ্যস্ত—তাই সরলভাবে জানালেন ভাত হলেই তাঁদের সুবিধে। সেইমতো পরদিন ভোরে মাতাজী নিজে বসে থেকে সাদরে তাঁদের বিভিন্ন পদ সহ ভাত খাওয়ালেন। আজ তাঁরা সসংকোচে মনে করেন, ভোর পৌনে পাঁচটার মধ্যে ভাত-তরকারি প্রস্তুত করা কতখানি অসুবিধাজনক হয়েছিল! রান্নার ঠাকুর অনেক পরে আসে, নিশ্চয়ই মাতাজী এবং সন্ন্যাসিনীরাই—হয়তো সারা রাত ডিউটি করে আসার পরই—তাঁদের জন্য রান্না করেছিলেন।

মাতৃভবনের এক জাতিকা যখন ডাক্তারি পাস করে মাতৃভবনে

আসেন ত্যাগব্রতীরূপে যোগদানের জন্য, মাতাজী তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর মা এসে মাতাজীকে দেখেই বলে ওঠেন, ''ও ইনি! ইনিই তো সেদিন (সন্তান জন্মানোর দিন) আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।'' শিশু জন্মালেই মাতাজী তাদের শ্রীরামকৃষ্ণ নাম শোনাতেন।

মাতাজী এলোমেলো কাজ একদম পছন্দ করতেন না। তাঁর নিজের কাজ যেমন ছিল সুপরিকল্পিত, গোছানো, তেমন অন্যেরাও গুছিয়ে কাজ করলে খুশি হতেন।

একদিন হসপিটালে রান্নার ঠাকুর আসেনি। মাতাজী জানতে চাইলেন কে রান্না করতে পারবে। জনৈকা ব্রহ্মচারিণী সোৎসাহে বলে ওঠেন, তিনি করবেন। কিন্তু তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। মাতাজীকেই আসলে সব দায়িত্ব নিতে হবে ভেবে অন্যেরা অসন্তুষ্ট হলেও মাতাজী সেই উৎসাহকে মূল্য দিলেন। পরদিন সকাল থেকে তিনি সেই ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে থেকে তাঁকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে কী করতে হবে। মাতাজী নিজে খুব ভাল রান্না করতে পারতেন।

হসপিটালের ডাক্তাররা বা পরিচিত ভক্তেরা সকলেই—কারও বাড়িতে কোনও বিপদ হলে বড়মার কাছে ছুটে আসতেন এবং অনুনয় করে বলতেন, ''মাকে একটু বলুন না!'' সকলের ভরসা ছিলেন বড়মা। প্রথম থেকেই তাঁকে দৈবী মানুষ বলে সকলে মনে করতেন।

জপের ওপর মাতাজী খুব জোর দিতেন। সকলকে রাতে জপ করতে বলতেন। বিশেষত পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশীতে আর শনি-মঙ্গলবার। নিজেও বসতেন। তাঁর সঙ্গে ট্রেনে যেতে যেতে অনেকেই দেখেছেন তিনি সারা রাত বসে জপ করছেন। মাতৃভবনে একবার কথাপ্রসঙ্গে একজন সন্ন্যাসিনীকে তিনি বলেছিলেন, ''এখন আমাকে মা কাজ করতে দিয়েছেন তাই কাজ করছি, যখন জপ করার সময় দেবেন তখন জপই করব।'' যে-সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের মাতাজী

বলতেন, ''কথা কম কাজ বেশি। সময় পেলে জপ করবে, জপ করতে ইচ্ছে না করলে বই পড়বে।'' যাঁরা বেশি লেখাপড়া না করার ফলে বা অসুস্থতার জন্য সঙ্ঘে যোগদান করতে পারেননি তাঁদের সবাইকে মাতাজী আশ্রয় দিতেন। তাঁদের নিয়ে রাতে, বিশেষত শনি-মঙ্গলবার জপে বসতেন। তাঁদের অনেকেরই জীবন তাঁর সান্নিধ্যে খুব উন্নত হয়েছিল। মাতাজী তাঁদের সবাইকে সম্মান দিয়ে খুব যত্ন করে রেখেছিলেন।

যাঁরা অসহায়, নিজেরা যেতে সক্ষম নন এমন ভক্তমহিলাদেরও তিনি তীর্থদর্শন করিয়েছেন নিজে সঙ্গে গিয়ে। একবার এমন কয়েকজনকে তীর্থ করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় জনৈকা সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে নিলেন তাঁদের সেবার জন্য। পরে মাতাজী সেই সন্ন্যাসিনীকে বলেছিলেন, ''তুমি যে এই বুড়োমানুষগুলোকে দেখলে এতেই তোমার হবে।''

ছোট-বড়, তথাকথিত উচ্চ-নীচ সকলের জন্য মাতাজীর সমান অনুভূতি। সকলেই সেটি বুঝতেন। যাকে কেউ পছন্দ করত না সেও বলত, ''হসপিটালে বড়মা কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন জানেন?—আমাকে।'' জমাদার থেকে সবচেয়ে উচ্চপদস্থ যিনি—সকলেই বলতেন, ''বড়মা যতদিন আছেন ততদিন যত অসুবিধাই হোক হসপিটাল ছেড়ে যেতে পারব না।''

আয়াদের মুখে শোনা যেত, ''বড়মা এখানে কাজ দিয়েছেন বলে আমরা সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারছি, নইলে কোথায় ভেসে যেতাম।'' একজন বলত, অসৎ পথে যাওয়া বা আত্মহত্যা ছাড়া যখন তার সামনে আর পথ খোলা নেই তখনই সে 'বড়মা'র কথা জানতে পারে এবং তাঁর কাছে এসে আশ্রয় ভিক্ষা করে। তিনি তাকে আশ্রয় দেন, তার জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেন। মাতাজী কালীঘাট সংলগ্ন বস্তি অঞ্চলে মোটামুটি শিক্ষিত মেয়েদের কাজ শিখিয়ে হসপিটালে কাজ দিতেন। 'সহায়িকা প্রশিক্ষণ' নাম দিয়ে হসপিটালের নিজস্ব একটি কোর্স

চালু করেছিলেন—তাতে অতিদরিদ্র মেয়েরা স্কলারশিপ সহ ট্রেনিং নিতে পারত এবং মাতৃভবনে তো বটেই, অন্যান্য জায়গাতেও কাজ পেয়ে যেত।

মাতৃভবনে মাতাজীর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ এসে কথা বলতেন। ডাক্তার-রোগী-ভক্ত বা পাগল যেই হোক—সকলের প্রতি মাতাজী একইরকম মনোযোগী, ধৈর্যশীল। কখনও কোনও বিরক্তি বা রাগ তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। এত ভালবাসা অথচ কথা বেশি বলতেন না। সবাই জানে 'বড়মা ভীষণ স্ট্রিক্ট'। যত পাগল, আধপাগল, ছিটগ্রস্ত সকলের অবারিতদ্বার মাতৃভবনে। যতক্ষণ ইচ্ছা মাতাজীর সঙ্গে আবোলতাবোল কথা বলে তারা খেয়ে বাড়ি ফিরত। তাঁর স্নেহস্পর্শ উন্মাদেরাও ঠিক বুঝতে পারত। একটি পাগলি এসে প্রায়ই খোঁজ করত—''বড়মাকে একটু ডেকে দাও না।'' কেউই মাতাজীকে খবর দিত না কারণ সকলেই জানত মাতাজী এলে সে ছাড়বে না আর মাতাজীও তাকে ছেড়ে উঠবেন না। মাতাজীর পা দুটি ধরে সে বসে থাকবে, মাতাজীকে গান শোনাবে। মাতাজীও বসে বসে গান শুনবেন। একবার এক পাগলি খুব খারাপ খারাপ কথা বলছে; শুনে এক ব্রহ্মচারিণী বলেছেন, ''এত খারাপ কথা বলছ তো, দেখো তোমাকে আজ চা দেব না।'' মাতাজী শুনতে পেয়েই বললেন, ''আজ থেকে খাতায় লিখে নাও—আর কোনওদিন মায়ের সংসারে কাউকে 'খেতে দেব না' একথা বলবে না।''

একজন সঙ্ঘে যোগদান করতে ইচ্ছুক কিন্তু দেখা গেল তাঁর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। হসপিটালের খাবার স্বাস্থ্যকর বলে মাতৃভবনে পাঠানো হল তাঁকে। তাঁর জন্য ভক্তিপ্রাণামাতাজীর স্নেহযত্নের অন্ত ছিল না। এমনকী তিনি গান করেন বলে তাঁর ঘরে একটি হারমোনিয়ামও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একবার নবাগতা এক ব্রহ্মচারিণীকে কালীপুজোর পর মাতাজী

বললেন, ''তোমার বাবা মা তো দিল্লি গেছেন। তোমার ভাই একা এখানে আছে। তাকে বলো ভাইফোঁটায় যেন সে মাতৃভবনে আসে।'' ভাইফোঁটার দিন মাতাজী তাঁর ভাইকে কাছে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়ালেন।

একবার ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে একসঙ্গে অনেকে গিয়েছেন। প্রসাদ পাওয়ার পর সবাই ঘরে চলে গেছেন, নবাগতা এক ব্রহ্মচারিণী রান্নাঘরে কয়েকটি অতিরিক্ত পাত্র মাজছেন দেখে মাতাজী নিঃশব্দে তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন আর বললেন, ''আমি তোমাকে সাহায্য করব।'' তাঁর সঙ্গে সব বাসন মেজে ধুয়ে মুছে যথাস্থানে রেখে তাঁকে নিয়ে তবে বিশ্রাম করতে গেলেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে নার্সিং পাঠরতা তিন-চারজন মেয়ে এক বিকেলে প্রথম এসেছে মাতৃভবনে মাতাজীর কাছে। কাউকে চেনে না তারা। মাতাজীর কাছে গিয়ে প্রণাম করলে মাতাজী যখনই শুনলেন ক্লাসের শেষে তারা এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেবিকাকে টাকা দিয়ে বললেন, ''ওদের জন্য গরম গরম চপ আনিয়ে দাও।'' তাঁর মধুর আচরণে, অপার্থিব ভালবাসায় বাঁধা পড়ে গেল তারা। তাদের মধ্যে একজন আজ সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী।

নবাগতা এক ব্রহ্মচারিণী সকালে ঠাকুরঘর ঝাঁট দিচ্ছেন। একটু একটু শীত পড়ছে, অথচ খুব বেশি গরম কাপড় নিয়ে আসেননি তিনি। মাতাজী এসে নিজের গা থেকে গরম চাদর খুলে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। মুখে মধুর হাসি। ব্রহ্মচারিণীর অনুভব হল তিনি নিজের জননীকেই পেয়েছেন।

একবার এক ব্রহ্মচারিণীকে রাতে ডিউটি দিতে বলায় তিনি জানান, পরদিন সকালে তাঁর বেবিক্লিনিকে ডিউটি আছে। তাঁর ভয়, রাত জাগলে সকালে যদি ক্লান্ত হয়ে কাজটি ঠিকমতো করতে না পারেন! মাতাজী তাঁকে বললেন, ''তুমি অসুস্থ হলে তোমার মা সারারাত জেগে তোমার

সেবা করে পরদিন বাবার জন্য রান্না করে তাঁকে অফিসে পাঠাননি?" ব্রহ্মচারিণী বুঝতে পারলেন দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যই মাতাজীকে এত মহান করেছে।

মাতাজীকে তাঁর নিজের জন্য কেউ কোনওদিন কিছু চাইতে দেখেননি। সবসময় অন্যদের কথাই ভাবতেন। বিশেষত যাঁরা তাঁর কাছে আছেন তাঁদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে কী না সবসময় খোঁজ নিতেন।

মাতাজীর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নিয়মানুবর্তিতা। তাঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যেত। রাতে ঘুমোতে যত দেরিই হয়ে থাকুক, ভোরবেলা ঠাকুরঘর খোলার সময় তিনি উপস্থিত থাকতেন। হসপিটালের দিনরাত ব্যাপী কর্মপ্রবাহের মধ্যেও ভোরে স্তবপাঠ, সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন, জপধ্যান—কিছুই বাদ যেত না তাঁর। সেই ধারা মাতাজী মাতৃভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের ক্লাস নিতেন বেলা তিনটের সময়। স্বামীজীর কোনও বই বা আর কিছু পড়ে শোনাতেন। ক্লাসে আসতেই হত—হসপিটালে ডিউটি করে ক্লান্ত বা এমন কোনও অজুহাত দেখানো যেত না। একবার এক ব্রহ্মচারিণী ক্লান্তির কথা জানালে মাতাজী বলেন, ''স্বামীজীর কথা পড়লে শুনলে শোয়া মানুষ উঠে বসে, বসা মানুষ উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়ানো মানুষ দৌড়োয় আর দৌড়নো মানুষ থামে না। আর তুমি কিনা বলছ ঘুম পাচ্ছে!"

হসপিটালে কখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিটিং হলে বড় বড় অফিসাররা আসতেন। অনেক আলোচনা হলেও, শেষে যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি বলতেন, ''অনেক কথাই তো হল। এবার বড়মা যা বলবেন আমরা তাই মেনে নেব।" বাস্তবিকই মাতাজী যা সিদ্ধান্ত নিতেন সকলে একবাক্যে মেনে নিতেন।

একদিন মাতৃভবনের দরজা খুলে দেখা গেল একটি সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে কেউ ফেলে রেখে গেছে। বড়মা তাকে একজনের কাছে রাখলেন, তার সব দায়িত্ব নিলেন। সে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে

হসপিটালে ভাল কাজ করত। মেয়েটি একদিন মাতাজীর মুখের ওপর খুব উদ্ধতভাবে নানা কথা বলে। উপস্থিত সকলে ক্রুদ্ধ হলেও মাতাজী শান্তভাবে বললেন, ''ওর যা আছে ও তা-ই আমাকে দিল, আমার যা আছে আমাকেও তো তা-ই দিতে হবে। ওর জন্য করেছি বলেই যে ও আমাদের এখানে কাজ করবে এ আমরা কেন আশা করব?''

একবার এক পেশেন্ট মারা গেছে। হসপিটালে উন্মত্ত জনতা এসে চিৎকার করছে। মাতাজী বেরিয়ে এলেন। কাউকে সঙ্গে নিলেন না, একাই চলে গেলেন তাদের কাছে। বললেন, ''বাইরে চলুন। হসপিটালের ভিতর গণ্ডগোল নয়, এখানে আমার মায়েরা আছেন।'' গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতেই সবাই শান্ত হয়ে চলে গেল।

এক বছর কালীপুজোয় হসপিটালের বাইরে রাস্তায় ছেলেরা বাজি ফাটাচ্ছে। অনেকে বারণ করলেও তারা শুনছে না। মাতাজী রাত দশটার পর রাস্তায় বেরিয়ে ধীরে ধীরে চারিদিকের রাস্তা ধরে একবার হসপিটালটা প্রদক্ষিণ করলেন আর তাদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন, মুখে একটিও কথা বললেন না। তাতেই ছেলেরা ক্ষান্ত হল।

একদিন একজন পেশেন্টের অবস্থা হঠাৎ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে কিন্তু তাঁর বাড়িতেও বিপদ—বাবা অন্য একটি হসপিটালে ভর্তি ছিলেন, তিনি মরণাপন্ন হওয়ায় বাড়ির সকলে সেখানেই আছেন। পেশেন্ট পার্টির অনুপস্থিতিতেই নিজে দায়িত্ব নিয়ে মাতাজী বন্ডে সই করে সেই পেশেন্টকে ও.টি.-তে তুললেন। আজও তাঁর পরিবারের সবাই কৃতজ্ঞচিত্তে বলেন, এ-কাজ একমাত্র বড়মা-ই করতে পারেন।

একবার মাতৃভবন থেকে একটি শিশু চুরি হয়ে যায়। মাতাজী হলঘরে মায়ের বড় ছবির সামনে টানা তিনদিন বসে থাকেন দরজা বন্ধ করে। তিনদিন পরে অভাবনীয়ভাবে শিশুটিকে পাওয়া গেল। সে-সংবাদ পেয়ে তবে মাতাজী বাইরে বেরোলেন। কোর্টে সেই সংক্রান্ত কেস চলেছিল। কোর্ট থেকে পরপর তিনবার নোটিস এলেও মাতাজী কাউকে পাঠালেন

না। একদিন আলিপুর কোর্ট থেকে এক অফিসার এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তিনটি চিঠি দেখিয়ে জানতে চান—এ-চিঠি তিনি পেয়েছেন কী না। মাতাজী জানান পেয়েছেন; কিন্তু মায়ের কোলে শিশু ফিরে গেছে এটাই শেষ কথা—কে দোষ করেছে বা কে শাস্তি পাবে তা নিয়ে তিনি আর ভাবতে চান না। তখন অফিসার বলেন, চিঠি পেয়েও কোর্টে না যাওয়ার, আদালত অবমাননার পরিণাম তিনি জানেন কি? মাতাজী বলেন যে তিনি জানেন না। তখন অফিসার বলেন—হাতকড়া। সঙ্গে সঙ্গে মাতাজী দুটি হাত বাড়িয়ে দেন। দেখে শুনে অফিসার আর কিছু বলতে পারেননি। মাতাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি ফিরে যান।

শিশুচুরির পর একদল মহিলা যাদবপুর থেকে মিছিল করে এসে হসপিটালের সামনে সভা করে বলতে থাকেন—শিশুকে হত্যা করে হসপিটালের ভিতরেই যে পুঁতে দেওয়া হয়নি তাই বা কে জানে। এমন কথা শুনেও মাতাজী নম্রভাবে তাঁদের বলেন, ''ঠিকই বলেছেন মা আপনারা। সব দোষ আমারই। দারোয়ান যে গাফিলতি করেছে সে তো আমারই দোষ, কারণ দারোয়ানকে তো আমিই নিয়োগ করেছি।'' মাতাজীর ব্যবহারে তাঁরা নরম হয়ে ফিরে গেলেন। তিনি প্রয়োজনে এত নিচু হতে পারতেন যে সবাই অবাক হয়ে যেত।

একদিন মাতাজী দেখলেন সময় হয়ে গিয়েছে অথচ যারা পেশেন্টদের খেতে দেবে তারা অনুপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডারিকে জপ থেকে ডেকে তুলে বললেন, ''মায়েরা খাবার পায়নি, আর তুমি এখানে বসে কার জপ করছ?'' তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে মায়েদের কাছে খাবার পাঠিয়ে দিতে বললেন। যেহেতু তাঁকে জপের আসন থেকে তুলে এনেছেন তাই নিজেই আবার ওপরে তাঁর ঘরে গিয়ে আসন এনে একতলার হলঘরে মায়ের বড় ছবির কাছে রেখে বললেন, ''আধঘণ্টা তুমি খাবার দাও, তারপর আমি অন্য কাউকে পাঠাচ্ছি, তারপর তুমি মায়ের কাছে আসনে বসে জপ করবে।''

প্রথমদিকে মাতাজী নিজের হাতে অক্লান্ত সেবা করেছেন রোগিণী ও শিশুদের। পরে হসপিটালের খুঁটিনাটি খবর রাখতেন। কোনও পেশেন্টের অবস্থা আশঙ্কাজনক শুনলে থমথমে মুখে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। তাঁকে কিছু খাওয়ানো যেত না তখন। রোগী বিপন্মুক্ত জানতে পারলে আগে মন্দিরে যেতেন।

মাতৃভবনে জন্মেছে এমন বহু শিশুর সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত মাতাজীর যোগাযোগ থাকত। বাবা-মায়েরাই তাদের নিয়মিত নিয়ে আসতেন মাতাজীর কাছে। তাঁর ব্যবস্থায় বস্তির শিশুরা মাতৃভবনে পড়তে আসত, সেখানে খেয়ে স্কুলে যেত।

একবার এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে হসপিটালে ভর্তি করতে এসে মাতাজীকে জানান, তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একথা শুনে মাতাজী জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কাছে দশ টাকা আছে কী না। আছে জেনে দশ টাকা নিয়ে মাতাজী বলেন, আর কোনও টাকা লাগবে না। এই ধরনের শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেদিন ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ পর্যন্ত তিনি মাতৃভবনে কম টাকায় দুধ সরবরাহ করেন।

কারও সম্পর্কে কোনওরকম সমালোচনা মাতাজী শুনতেন না বা করতেন না। পরনিন্দার কোনও প্রশ্রয় ছিল না তাঁর কাছে। একেবারেই পছন্দ করতেন না কারও নামে কথা বলা। যদি নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলতেই হয় তো তাঁর ব্যবস্থাপত্র ছিল—"শ্রীশ্রীমাকে বলো।"

একবার ভারতীপ্রাণামাতাজী, ভক্তিপ্রাণামাতাজী, শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী ও নির্মলপ্রাণামাতাজী ট্রেনে কোথাও যাচ্ছেন। নির্মলপ্রাণাজী তখন নবাগতা—নিজের বিছানা নিয়ে যাননি, হয়তো ভেবেছিলেন দরকার নেই। প্রথমে ভারতীপ্রাণামাতাজীর বিছানা করে দিয়ে ভক্তিপ্রাণাজী নিজের ও শ্রদ্ধাপ্রাণাজীর বিছানা থেকে কিছু কিছু নিয়ে নির্মলপ্রাণাজীর জন্য বিছানা করে দিলেন। এতে শ্রদ্ধাপ্রাণাজী নির্মলপ্রাণাজীর ওপর একটু

অসন্তুষ্ট হলে ভক্তিপ্রাণাজী তাঁকে বোঝালেন যে, ভারতীপ্রাণামাতাজীকে উদ্দেশ করেই তাঁরা সব করছেন, এখানে অন্য কারও সম্পর্কে ভাবনার অবকাশই নেই। পরবর্তী কালে সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রদ্ধাপ্রাণাজী এই ঘটনাটি স্মরণ করে ভক্তিপ্রাণাজীর নির্বিকার ভাব, অদোষদর্শিতা ও উদ্দেশ্যের একমুখিনতার কথা বলতেন।

দমদম বিদ্যাভবন কলেজ একবার বিপুল বন্যায় ভেসে গিয়েছে। জল যেই একটু নামল, মাতাজী সেখানে গাড়ি ভর্তি করে বস্তা বস্তা ব্লিচিং পাউডার নিয়ে গেলেন। একবার কলেজে রাতে ডাকাতি হয়েছিল, নাইট গার্ডকে ডাকাতরা গুলি করেছিল। খবর জেনে তিনি পরদিন সকালে খাবার নিয়ে উপস্থিত। বুঝতে পেরেছিলেন ওই পরিস্থিতিতে খাবার তৈরি বা খাওয়ার দিকে কারও মন থাকবে না।

সবার প্রতি অসামান্য ভালবাসা অথচ সঙ্গে মিশে থাকত অপার নির্লিপ্তি। এক ব্রহ্মচারিণী অনেক বছর মাতৃভবনে থেকে হসপিটালে বিভিন্ন কাজ শিখেছেন; তারপর যখন তাঁকে অন্য সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার কথা হল তখন মাতৃভবনের একজন মঠে এসে পূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীকে বলেছিলেন, ''আপনারা এটা কীরকম ডিসিশন নিলেন! বড়মা এতদিন ধরে ওঁকে তৈরি করলেন আর আপনারা এখন ওঁকে পাঠিয়ে দেবেন?'' শুনে ভক্তিপ্রাণামাতাজী হেসে বলেন, ''কে কাকে তৈরি করে!'' শ্রীশ্রীমা-ই সবাইকে তৈরি করেন, আবার মায়ের ইচ্ছানুসারেই আশ্রমিকরা বিভিন্ন কেন্দ্রে যান—এই মনোভাব তাঁর মজ্জাগত ছিল। বহু বছর একসঙ্গে আছেন এমন একজন সন্ন্যাসিনী যখন শেষ শয্যায়, তখন তাঁর সেবা মাতাজী নিজের হাতে করেছিলেন। মাতাজীর ভালবাসা দেখে সবাই ভাবতেন, তাঁর শরীর গেলে মাতাজীর মনে কী কষ্টটাই না হবে! অথচ সত্যিই যখন তাঁর শরীর চলে গেল, মাতাজী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে করণীয় সবই করলেন কিন্তু অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে। এমন আর-একটি ঘটনা। মাতাজী তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষা। এক ভক্ত তাঁর

সংসারের কষ্টের কথা জানিয়ে খুব কান্নাকাটি করছেন। মাতাজী তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন, মায়ের কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করে ঘরে এলেন। ঘরে এসে সেবিকারা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছেন শুনে মাতাজী বললেন, ''আবার তোমরা এইসব নিয়ে কেন কথা বলছ? ওঘরেই তো হয়ে গেছে।'' তেমনই, ঊনষাট বছর মাতৃভবনে থাকার পর যখন মঠে চলে আসার কথা হয় তখনও এ নিয়ে মাতাজীর কোনও কথা বা কোনও আবেগ দেখা যায়নি।

মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিনীরা বলতেন, পাণ্ডিত্য-বিদ্যাবুদ্ধি এসব কিছুই লাগেনি—শুধুমাত্র হৃদয়বত্তা দিয়ে মানুষ যে কোথায় উঠতে পারে তা বড় কল্যাণীদিকে দেখে বোঝা যায়। বস্তুত ওই অপূর্ব হৃদয়বত্তা তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড কর্মতৎপর জীবনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল নীরব একটি সাধনজীবন—যার মূল সুর শরণাগতি আর আত্মবিলয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে মাতাজী শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষা হন। পূজনীয়া মোক্ষপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণের পর সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষা হতে চাননি, বলেছিলেন, ''এখন নয়।'' পূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর মহাসমাধি লাভের পর ২ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে তিনি চতুর্থ সঙ্ঘাধ্যক্ষা পদে বৃত হন। তাঁর সময়ে বিভিন্নভাবে মঠ ও মিশনের কার্যধারার সম্প্রসারণ ঘটে। মাতাজী ২০০৫ সালের ২৮ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরে শ্রীসারদা মঠের শাখাকেন্দ্রে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। গুজরাতের বালসাড কেন্দ্রে প্রার্থনাগৃহের বিস্তীর্ণ অংশের উদ্বোধন সম্পন্ন করেন ২০০৬ সালের ১১ জুলাই, ভুবনেশ্বর মঠে প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিস্থাপন করেন ২০০৮ সালের ৩০ মে। ওই বছরই ২৫ জুলাই কলকাতার বেহালা স্থিত সিরিটি কেন্দ্রে ডিসপেনসারি বিল্ডিং-এর

দোতলা এবং ইউ এস জি ইউনিট; এবং ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে রান্নাঘর ও ডাইনিং হল উদ্বোধন করেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হয়ে ২০০৯ সালের ৭ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের কান্তনগরে মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র উদ্বোধন করেন মাতাজী। এরপর ২ জানুয়ারি ২০১০ শিহড় কেন্দ্রে কোচিং স্কুল ভবন, ২৬ মার্চ ২০১০ ভুবনেশ্বরে নবনির্মিত মন্দির, ১৭ জানুয়ারি ২০১১ মাতৃভবন হসপিটালে পেডিয়াট্রিক ইনডোর ইউনিট সহ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের ডে কেয়ার সেন্টার, ১২ এপ্রিল ২০১১ ইন্দোর কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি ইউনিট, এবং ৪ মে ২০১১ বালুরঘাট কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। ২০১২ সালের ৩ মার্চ পুনায় স্কুল ভবন, ২১ ডিসেম্বর বলদবাঁধ কেন্দ্রে নবনির্মিত মন্দির, ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দমদমে রসিক ভিটা কম্পিউটার সেন্টারের নতুন শাখা উদ্বোধন করেন তিনি। ২০১৪ সালের ২ মে ব্যাঙ্গালোরে নতুন মন্দির উৎসর্গীকৃত হয় মাতাজীর হাতে। তিনি ২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মাতৃভবনে নার্সিং স্কুল 'বিবেকানন্দ এডুকেশনাল কমপ্লেক্স', ২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর নাগপুরের কাম্পটি কেন্দ্রে মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ, ২০১৭ সালের ৪ মার্চ বারুইপাড়া শিক্ষামন্দির কেন্দ্রে সন্ন্যাসিনীদের বাসভবন উদ্বোধন করেন। মাতাজী বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাসগৃহের ওয়েবসাইট লঞ্চ করেন ২০১৮ সালের ২৪ অক্টোবর, দক্ষিণেশ্বর মূল কেন্দ্রে বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসিনীদের জন্য নবনির্মিত 'ভারতীপ্রাণা ভবনে'র উদ্বোধন করেন ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর। সিরিটি কেন্দ্রের প্রার্থনাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তরখণ্ড স্পর্শ করেন এবং অর্ঘ্য দেন ২০২২ সালের ১ জুলাই। ২০০৯ ও ২০১৩ সালে মাতাজী চেন্নাই, ত্রিচুর ও ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রে যান। দিল্লি কেন্দ্রে তিনি বহুবার গেছেন।

সঙ্ঘাধ্যক্ষা হয়ে মঠে আসার পর (এপ্রিল ২০০৯) মাতৃভবনের সেই কোমলে-কঠোরে মেশা মাতৃমূর্তি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তর্মুখ অবস্থা, বিশেষ করে শেষ কয়েক বছর তাঁর মাতৃময়তা সকলকে

মুগ্ধ করত। একটি-দুটি কথা, হাসিমুখ, সস্নেহ দৃষ্টিই সকলকে আনন্দে ভরিয়ে দিত। তিনি কথা বেশি না বললেও, তাঁর কাছে কয়েক মুহূর্ত থাকলেই মনে এক অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি হত যা সকলেই অনুভব করতেন। অভয় ও আশ্বাসে পূর্ণ গুরুশক্তি যেন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিশেষত শেষ দু-বছর তাঁর অতি আনন্দময় সান্নিধ্য মঠবাসিনীদের ভরিয়ে রেখেছিল। ঘরে ঢুকলেই হাসিমুখে বলতেন, ''এসো, ভাল আছ? ভাল থাকো।'' স্তব, সংগীত, বিশেষত মাতৃসংগীত শুনতে ভালবাসতেন বলে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীরা প্রায়ই তাঁর বাসভবনে সন্ধ্যারতির পর সমবেত হয়ে অথবা এককভাবে তাঁকে গান শোনাতেন। মাথা দুলিয়ে টেবিল বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে বা হাত নেড়ে—বিভিন্ন ভঙ্গিতে মাতাজীর সানন্দ সঙ্গত সকলকে উৎসাহিত করত। ছোটবেলা থেকেই মাতাজী গান ও স্তবগুলি মুখস্থ করেছিলেন; তাই বয়স শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও তাঁর সেই সংক্রান্ত স্মৃতি ছিল অটুট। কেউ গান গাইতে গিয়ে পঙ্‌ক্তি ভুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিতেন।

শেষ দু-বছর মাতাজীর কাছে পালা করে সন্ন্যাসিনীরা নাইট ডিউটি দিতেন। একদিন রাতে ডিউটিতে থাকা সন্ন্যাসিনীকে মাতাজী বললেন—তুই ঠাকুরকে দেখেছিস?

—না।

—মাকে?

—না।

—সে কী রে, কাউকেই দেখিসনি?

—মাতাজী আপনি মাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ ভাই দেখেছি।

—কেমন দেখতে?

—সে মুখে বর্ণনা করা যায় না। উজ্জ্বল চেহারা।

—মাতাজী আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ ভাই দেখেছি। যখন তখন তিনি কৃপা করে দেখা দেন।

—কেমন দেখতে?

—সে মুখে বর্ণনা করা যায় না। খুব ভাল লাগে, আনন্দ হয় এটুকু বলতে পারি।

—মাতাজী আমি ঠাকুরকে দেখতে পাব?

—ব্যাকুল হয়ে ডাকলে দেখতে পাবে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি দেখা দেন। যারা ভাল মানুষ, যারা মিথ্যা কথা বলে না, যারা ঝগড়া করে না, তাদের ঠাকুর দেখা দেন।

—ব্যাকুলতা তেমন হয় না কেন মাতাজী?

—ব্যাকুলতার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। আমাকে কে নিতে আসবেন জানিস?

—কে, মাতাজী?

—ঠাকুর।

—আমাকে কে নিতে আসবেন?

—তোকে মা নিতে আসবেন। তুই মায়ের কাছে যাবি। ঠাকুর মা একই।

—মাতাজী আমার এ-জন্মে মুক্তি হবে?

—আমি ওসব চিন্তাও করি না। আমি শুধু জানি মা আছেন আর আমি আছি। মা ছাড়া আমি আর কোনও চিন্তা করি না। আমি মায়ের মেয়ে, আর কিছু আমি জানি না। মা মা মা।

—মা আপনার সঙ্গে কথা বলেন, আমার সঙ্গে তো বলেন না।

—মায়ের সঙ্গে কথা বলবি, তোর সঙ্গেও কথা বলবেন।

আর একদিন রাতে যিনি আছেন তাঁকে মাতাজী বললেন, ''মাকে দেখবি? ডাকব?'' বলেই মায়ের ছবিটি (তাঁর বিছানাতেই থাকত) নিয়ে খানিকক্ষণ দেখে মাথার কাছে রেখে দিয়ে বললেন, ''মা এখন আসবেন

না বলছেন।"

মাতাজী প্রায়ই বলতেন, ''এই ঘরে মা থাকেন জানিস?"

একজন সন্ন্যাসিনী প্রায়ই বলতেন, ''মাতাজী আপনি কী করে এত ভাল হলেন?"

প্রতিবারই একই উত্তর, ''ঠাকুর মাকে চিন্তা করে। (বুকে হাত দিয়ে) এখানে মা আছেন। এছাড়া আমি আর কিছু চিন্তা করি না, আর কিছু জানি না। মা কোনওদিন আমাকে ছাড়বেন না। মা আছেন আর আমি আছি। আমার ভাবনা নেই।"

একদিন মাতাজী বললেন, ''ভগবানের চিন্তা করতে করতে চলে যাব।"

আর একদিন—''আমাকে কে আনতে আসবে জানিস? ঠাকুর।"

একরাত্রে একজন সন্ন্যাসিনী বলছেন, ''মাতাজী, শুভরাত্রি।"

মাতাজী বললেন, ''শুভরাত্রি কি এমনি এমনি হয়? শুধু জেগে থাকলে হয় না। তাঁর স্মরণ-মনন করলে শুভরাত্রি হয়।"

—মাতাজী, ঠাকুর যদি সবার গুরু হন তাহলে শ্রীশ্রীমা কে?

—মা তো জগজ্জননী!

—আপনার মা কী করছেন? কিছুই দেখছেন না।

—মা না দেখলে আর কে দেখছে?

—তাহলে এত অসুখ-বিসুখ কেন?

—শরীর থাকলেই এসব হবে।

—মাতাজী আপনি সবসময় বই পড়েন কেন?

—বই পড়া মানে তাঁর সঙ্গে থাকা।

তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বিদ্যুচ্চমকের মতো ধরা পড়ত। এক সকালে মাতাজী সেবিকাকে বললেন—আমি কালী, আমাকে পুজো কর।

শুনে সেবিকা বলতে লাগলেন—এই ফুল দিলাম, এই বেলপাতা দিলাম। আমার মানসে পূজা।

মাতাজী বলছেন—ও কী রে!

—তাহলে নিচে গিয়ে বাগান থেকে জবা নিয়ে আসি?

—তোর ফুল আনতে আনতে কালী চলে যাবে।

আর একদিন সকালে মাতাজী বললেন—আমি মন্দিরে যাব। আমাকে মা বলছেন, অনেকদিন আমায় দেখতে আসনি, এসো।

মাতাজী বিভিন্ন সময়ে মঠবাসিনীদের কাছে বলতেন, ''ঠাকুরকে মাকে ভালবাসবে। সবসময় ঠাকুরের মায়ের স্মরণ-মনন করবে। যা করবে সবই জানবে শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়েরই কাজ। স্মরণ-মনন না অভ্যাস করলে একটুতেই অহংকার, অভিমান, রাগ হয়ে যায়। অভ্যাসযোগ অভ্যাস না করলে হবে না। মায়ের জীবন দেখো। জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন কত সহ্য, কত সন্তোষ। মা বলছেন, ''যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।'' সবসময় নিজের দোষগুলি খোঁজার চেষ্টা করবে। কারও দোষ কখনও মনে আনবে না। মা যেখানে রাখবেন ঝড়ের এঁটো পাতার মতো থাকবে। যেখানেই থাকো, জানবে সবই মায়ের কাজ।

''প্রথম প্রথম আমি খুব কল্পনার জগতে থাকতাম। ভাবতাম নির্জনে থাকব, সাধনা করব। [কিন্তু দেখলাম হসপিটালের পরিস্থিতি আলাদা।] যখন-তখন বেল বাজলেই ছুটতে হত। হয়তো স্নান করছি, খাচ্ছি—বেল শুনলেই ছুটতাম। তখন মনে হল যে আমার তো কিছু বলার অধিকার নেই। মা যেমন করাবেন, সবই মায়ের কাজ। সবসময় অভ্যাস করবে স্মরণ-মনন করার। জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? কেন এসেছ মঠে? অভ্যাস করে তাঁকে ভালবাসতে হবে। সেই যে গানে আছে না—'শয়নে প্রণামজ্ঞান নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান'। সবসময় তাঁকে চিন্তা করলে উগ্র

হতে পারবে না। তাঁকে চিন্তা না করলেই মনটা চঞ্চল হয়, মন রাগ-ঝাগ করে। স্মরণ-মনন করার অভ্যাস যে করবে সে-ই শান্তি পাবে। এ তো আর ঔষধ নয় যে গুলে খাইয়ে দেবে। মায়ের হাতে সব আছে। মাকে খুব ভালবাসবে। অনুরাগ চাই। তা না হলে শুধুই বসে বসে 'ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট' করবে আর ঢুলবে। কিছুই হবে না।

''দুটি মন থাকে—একটি বহির্মুখী ও অন্যটি অন্তর্মুখী। কারও দোষ দেখছ না তো? মা বলেছেন একথা। ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা এলে তবে ডুব দেওয়া যায়। অভ্যাস করতে হবে। বিনা অনুরাগ নেহি মিলে নন্দলালা।

''মা কৃপা করেছেন বলেই তো এখানে এসেছ। তা না হলে কোথায় থাকতে তার ঠিক নেই। ঠাকুর-মাকে ভালবাসবে। অনেক ভাগ্য যে সারদা মঠে আশ্রয় পেয়েছ, আমাদের কোনও ঝামেলা নেই। সংসারী মানুষের কত কষ্ট! ঠাকুরের কৃপায় মঠে আছ, নাহলে সংসারে ফিরে যেতে। মাকে চিন্তা করলেই বড় জীবন হয়ে যায়। তাঁদের চিন্তা করো, ডুব দাও। মাকে ভালবাসো। মায়ের কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। মা সবার মা। মাকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা থাকলেই মা আসবেন। খুব অনুরাগের সঙ্গে যেন জপ করতে পারি—মাকে বললেই মা শুনবেন।

''মনটাকে নিয়ে ঝামেলা হলেও মন দিয়েই তো ঠাকুর-মাকে চিন্তা করবে। মনটাকে কি পুকুরপাড়ে রেখে আসবে? কথা কম কাজ বেশি। সময় পেলে জপ করবে, জপ করতে ইচ্ছে না করলে বই পড়বে। কারও দোষ নিয়ে অন্যের কাছে বলবে না। সত্য কথা বলবে, ঝগড়া করবে না, জপের সময় ঘুমোবে না।''

অনেক সময় মাতাজীর মুখে শোনা যেত বুদ্ধিদীপ্ত সরস ছোট্ট ছোট্ট কথা। মাতাজীর একজন সেবিকার নাম অকামপ্রাণা। মাঝে মাঝে মাতাজী কৌতুক করে বলতেন, ''কোনও কাজ নেই তাই অকাম।'' আবার কখনও

ডাকতেন—''অকাম, come.''

একদিন মাতাজীর খাওয়ার শেষে জলে একটু লেবুর রস দিয়ে সেবিকা বলছেন, ''মাতাজী, খেয়ে নিন। খেলে মুখ ছেড়ে যাবে।'' মাতাজী জানতে চাইলেন—''মুখ ছেড়ে কোথায় যাবে? দিল্লি?''

আবার কখনও বলেছেন, ''মুখ কে ধরে রেখেছে?''

কখনও মাতাজী অনেক কথা বলছেন শুনে সেবিকা বললেন, ''এত কথা বললে গলা বসে যাবে।''

মাতাজীর প্রতিপ্রশ্ন—''কোথায় বসবে? মাটিতে?''

একদিন মাতাজী দুপুরে প্রসাদ পাচ্ছেন। দেরি হচ্ছে দেখে সেবিকা বললেন, ''তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। সবাই শুয়ে পড়েছে।'' মাতাজী বলতে থাকলেন, ''এই ঘরে থেকে কী করে জানলে সবাই শুয়ে পড়েছে? তুমি কি সবাইকে দেখতে পাচ্ছ? একটা কথা বললেই হল? সবাই তো শোয় না! যারা স্কুলে যায়, যারা অফিসে কাজ করে তারা কী করে দুপুরে শোবে?''

কোনওদিন সেবিকা বলেছেন, ''তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, না খেলে হনুমান এসে কামড়ে দেবে।'' মাতাজী খাওয়া থামিয়ে হাসিমুখে বললেন, ''আমাকে কামড়াবে আর তোকে ছেড়ে দেবে?''

মাতাজীর রান্না হত আলাদা, লঙ্কা ছাড়া। তবু প্রায় সব খাবার খেয়েই বলতেন, ''বিষম ঝাল!'' একদিন সেবিকা বলছেন, ''একদিন মিষ্টি দিয়ে সব রান্না করে দেব; মাছে মিষ্টি দেব, তরকারিতে মিষ্টি দেব...।'' মাতাজী মধুর হাসি হেসে পাদপূরণ করতে জানতে চাইলেন—''ভাতে?''

একদিন সেবিকা সুর করে বলছেন, ''সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি...।'' সঙ্গে সঙ্গে মাতাজী একই সুরে বলে উঠলেন, ''সারাদিন আমি যেন মারামারি করি।''

একদিন সেবিকা ব্যায়াম করাচ্ছেন। মাতাজীর ব্যায়াম করতে সেদিন একেবারে ইচ্ছে নেই। বারবার বলছেন, ''ছেড়ে দে।'' সেবিকা কোনও

কথা না বলে কোনও দিকে না তাকিয়ে ব্যায়াম করিয়েই চলেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে, মাতাজী যে আসছে তাকেই সেবিকাকে দেখিয়ে বলছেন, ''এ চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না—এর কী যে হবে!''

কখনও কখনও কাছে যে থাকত মাতাজী তার নাম জানতে চাইতেন। নাম বললেই বলতেন, ''আমার নাম জানিস? আমার নাম কল্যাণী, ভক্তিপ্রাণা। আমার কাছে ভক্তি আছে।'' যদি বলা হত, ''মাতাজী, আমাকে একটু ভক্তি দেবেন?'' মধুর অথচ দৃঢ়স্বরে বলতেন, ''ভক্তি দিন বললেই দেওয়া যায় না। তপস্যা করতে হয় ভক্তির জন্য। ঠাকুর মায়ের কাছে বলতে হয়।''

একদিন মঠে এক ভক্ত এসে মাতাজীকে বললেন, তিনি দেখছেন যারা যত ভালমানুষ, ঠাকুর-মাকে নিয়ে থাকে, তাদেরই ভগবান বেশি কষ্ট দেন। এমন অন্যায় অবিচার কেন? মাতাজীকে কেউ কোনওদিন উত্তেজিত হতে দেখেনি, কিন্তু সেদিন বারবার একথা শুনে মাতাজী একটু উঁচুগলায় তাঁকে বললেন, ''কে কার প্রতি ন্যায় বা অন্যায় করছে সে-বিচার করবার তুমি কে? মায়ের লীলা কে বুঝতে পারে? তিনি কাকে কী করলেন কেন করলেন এসব তুমি কেন ভাববে? তোমার ঠাকুরকে ডাকার কথা, তাঁর নাম করার কথা। তুমি তা-ই করে যাও। ঠাকুরকে ভালবাসতে হবে। ঠাকুরকে ভালবাসলে ওসব হাবজি-গাবজি মনে আসবে না। মা বলেছেন না—যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না।''

আর একদিন এক ভক্ত জানতে চান—''মা, ভগবানের দিকে এগোচ্ছি কী না, কী করে বুঝব?'' মাতাজী বললেন, ''বেশি করে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছে হবে।''

মাতাজীর শরীর শেষ পর্যন্ত মোটামুটি ভালই ছিল। ২০২২ সালের প্রথমদিক থেকে তাঁর অন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়। এর সঙ্গে ফুসফুসের সমস্যা যোগ হওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে

ভর্তি করতে হয়। ক্রমশ শারীরিক জটিলতা বাড়ে, তিনি সেপটিসেমিয়ায় আক্রান্ত হন। কথামৃতের প্রতি মাতাজীর গভীর আকর্ষণ ছিল। হসপিটালে রাইলস টিউব থাকায় মাতাজীকে চশমা পরানো যাচ্ছিল না। তবু বলছেন, ''পড়তে পারব।'' একজন সন্ন্যাসিনী সামনে কথামৃত ধরে থাকলেন, মাতাজী পড়লেন। কয়েক ঘণ্টা পর সেবিকা জানতে চাইলেন, ''খালি চোখে কী পড়লেন?'' মাতাজী যা পড়েছেন হুবহু বলে দিলেন—''সচ্চিদানন্দই গুরু; যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ওই রূপ ধারণ করেছেন।'' এইটিই মাতাজীর শেষ কথামৃত পড়া, শরীরত্যাগের দুদিন আগে। ১১ ডিসেম্বর ২০২২ রাত ১১.২৪ মিনিটে মাতাজী মহাসমাধিতে লীন হন। তখন তাঁর বয়স ১০২ বছর দুমাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে মাতাজীই ছিলেন সর্বশেষ। শ্রীসারদা মঠের প্রথম আটজন সন্ন্যাসিনীরও তিনি শেষ প্রতিনিধি। তাই বলাই যায়, তাঁর মহাপ্রয়াণে একটি যুগের অবসান হল। তাঁর গুরুদেব স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মতোই তিনিও ছিলেন চতুর্থ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। গুরুর সঙ্গে আরও একটি কৌতুককর সাদৃশ্য আমাদের মনে জাগছে। মাতাজী দেহত্যাগের আগে কয়েকদিন ধরে হিন্দিতে কথা বলছিলেন—যে-কেউ তাঁর ঘরে যাচ্ছিল তার সঙ্গেই। তাঁকে এমনটি করতে এর আগে মঠবাসিনীরা দেখেননি। পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথাগুলিতে তাঁর মুখে যে-ধরনের হিন্দি বুলি দেখা যায়, মাতাজীর মুখেও তেমনটি শুনে সবাই নির্মল কৌতুক অনুভব করছিলেন। এই ঘটনা কি মানুষগুরু তথা সচ্চিদানন্দ-গুরুতে মিলে যাওয়ারই দৈব ইঙ্গিত ছিল না?

মাতাজীর মহাপ্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকেই। টুইটে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

''শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের মাধ্যমে সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাওয়ার জন্য প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজী চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী একটি শোকবার্তায় বলেন, ''প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর জীবনাবসান সমস্ত অনুরাগী ও ভক্তদের কাছে অতুলনীয় ক্ষতি।''

শ্রীরামকৃষ্ণ-করুণাগঙ্গা অবনীর বক্ষ প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। অবতারপুরুষের লীলাবসানের পর তাঁর পার্ষদবৃন্দ, তাঁরা অপ্রকট হওয়ার পর তাঁদের সন্তানগণ, আবার তাঁদের শরীররক্ষার পর তাঁদের শিষ্যগণ—এই ধারায় চলেছে করুণাগঙ্গার প্রবাহ। আমরা বসে আছি সেই প্রেমসুরধুনীর তীরে। দেখে যাচ্ছি,

''তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।''

একের পর এক সঙ্ঘগুরু আসেন, চলে যান। ''তবু অনন্ত জাগে।'' স্বামী প্রেমেশানন্দজীর ভাষায় : ''দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়—আবার আর এক প্রতিমা তার জায়গায় বসিয়ে পূজা করা হয়। আমাদেরও এক-একজন সঙ্ঘগুরু চলে যাচ্ছেন—শূন্যস্থানে আবার আমরা নতুন প্রতিমা বসাচ্ছি। এ প্রতিমা ঠাকুরেরই প্রতিমা।'' গঙ্গায় বিসর্জিত প্রতিমা তো গঙ্গাতেই লীন হয়ে থাকে! যে-তরঙ্গ মিলিয়ে গিয়েছে, সে তো নদীতেই মিশে আছে! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-গঙ্গায় মিশে আছেন সকল সঙ্ঘগুরু। এখানে কেউ কোথাও যান না। ''নাহি ক্ষয় নাহি শেষ।'' তাঁদের সঙ্গে তাই আমাদের বিচ্ছেদও ঘটতে পারে না। ধ্যানগম্য হয়ে তাঁরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম হয়ে যান। তাঁদের শুভ আশিস, সকরুণ স্নেহ আমাদের অজ্ঞান দূর করে, চোখ খুলে দেয়। আমরা 'হয়ে উঠতে' থাকি। এগিয়ে চলি সেই তুঙ্গলক্ষ্যের অভিমুখে—যেখানে নিত্য উৎসব, নিত্য শ্রী, নিত্য মঙ্গল।